ইরাক যুদ্ধে জার্মান-মার্কিন গোপন আঁতাত

ইরাক যুদ্ধে জার্মানীর প্রকাশ্য ভূমিকা ছিল মার্কিন বিরোধী। অথচ গোপনে মার্কিন সেনাবাহিনীকে গোয়েন্দা তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেছে জার্মান গোয়েন্দারাই। এই গোপন আঁতাতের খবর এখন বেরিয়ে আসছে...

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

থলের যে বেড়ালটা এতদিন লুকিয়ে ছিল, অবশেষে সেটা বেরিয়ে এল। বলছি সদ্য সাবেক হওয়া জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডারের কথা। ইরাক-যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনেক নীতিকথা শুনিয়ে মন ভরিয়েছিলেন ভদ্রলোক। এখন দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের তাবৎ শান্তিবাদী মানুষকে একদম লেজে খেলিয়েছেন তিনি। হঠাৎ প্রকাশ, মুখে সমালোচনা থাকলেও যুদ্ধের শুরুতে জার্মান গোয়েন্দারাই বুশ বাহিনীকে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেছে। হাটে হাঁড়ি ভাঙার এই কাজটি প্রখ্যাত জার্মান সাময়িকী ডার স্পেইগালের। একেবারে মোক্ষম সময়ে। যখন কিনা শ্রোয়েডারের সামরিক বাহিনীর প্রধান নতুন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তোড়জোর শুরু করেছেন।

জার্মান বাহিনী কর্তৃক এই তথ্য পাচারের বিষয়টি মিডিয়ায় ফাঁস করেছেন পেন্টাগনের সাবেক এক কর্মী। রীতিমতো চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা যাচ্ছে, বাগদাদে মার্কিন বিমান হামলার লক্ষ্যবস্তু সংক্রান্ত তথ্যগুলো জার্মান আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএনডি (BND বা Bundesnachrichtendienst) যুগিয়েছে। বাগদাদে নিযুক্ত সংস্থাটির দুজন গোয়েন্দা এ কাজ করেছে। সবচেয়ে নাটকীয় ব্যাপার হলো, ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল সাদ্দাম হোসেনের ওপর হামলা প্রচেষ্টার তথ্য জার্মান গোয়েন্দাদের দেয়া। পেন্টাগন সূত্রের মতে, মার্কিন গোয়েন্দাদের সে দিন সকালে জানানো হয়, বাগদাদের একটি রেস্তোরাঁয় কালো লিমুজিনে চড়ে যারা আসেন তাদের মধ্যে সাদ্দাম সরকারের উচ্চপর্যায়ের লোকজন ছিলেন। যাত্রীদের মধ্যে এমনকি সাদ্দাম হোসেন নিজেও থাকতে পারেন। মার্কিন কর্মকর্তারা এই খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যোগাযোগ করেন জার্মান গোয়েন্দাদের সঙ্গে। অনুরোধ জানানো হয়, তারা যেন নিজেরা গাড়ি চালিয়ে ব্যাপারটি পরখ করে আসেন। বাগদাদের জার্মান গোয়েন্দারা এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন যে, ভবনের বাইরে সশস্ত্র প্রহরায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই চারটি স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত বোমা আঘাত হানে রেস্তোরাঁয়।

হাটে হাঁড়ি ভাঙার পর এখন চলছে স্বীকার-অস্বীকার পর্ব। শ্রোয়েডার হাতের কাছে নেই। সমালোচনার ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে নয়া জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার স্টেইনমেয়ারকে, যিনি সে সময় ছিলেন শ্রোয়েডারের চিফ অব স্টাফ। ফ্রি ডেমোক্রেট (এফডিপি), গ্রিন পার্টি এবং বাম দল মিলে ভোট দিয়েছে ঘটনার তদন্তে বিশেষ সংসদীয় তদন্তদল গঠনের পক্ষে। দাবি উঠেছে স্টেইনমেয়ারের পদত্যাগের।

ইরাক যুদ্ধের আগে শ্রোয়েডার বুশের সমালোচনামুখর থাকলেও আঁতাত করেছেন গোপনে

বেচারা স্টেইনমেয়ার! গত নবেম্বরে চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেল ক্রিশ্চিয়ান এবং সোস্যাল ডেমোক্রেটদের নিয়ে যে গ্রান্ড কোয়ালিশন করেছেন, তাতে গেরহার্ডের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার ভাগে পড়েছে। এখন বুঝি তাকে ছাড়তে হয় সেই পদ। মান বাঁচাতে স্টেইনমেয়ার এবং জার্মান গোয়েন্দা বাহিনী বিএনডির বর্তমান প্রধান আর্নস্ট আর্লাও তারস্বরে বলছেন, তাদের সংস্থা কোনো রকম তথ্য কারো কাছে পাচার করেনি। আসলেই কি তাই?

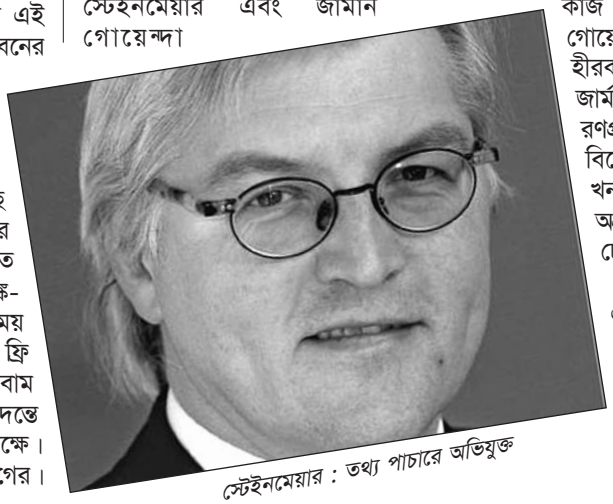

স্টেইনমেয়ার : তথ্য পাচারে অভিযুক্ত

বার্লিন থেকে ওয়াশিংটনকে জানানো হয়েছিল, বাগদাদে বিএনডির দুই এজেন্ট কাজ করছে। যুদ্ধ শুরুর পরেই মার্কিন গোয়েন্দাদের কাছে এই দুজন রীতিমতো হীরকখন্ড বনে যান। বহুবার মার্কিনিরা জার্মানদের কাছে সাদ্দাম হোসেনের রণপ্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। বিশেষ করে বাগদাদকে ঘিরে পরিখা খনন এবং মার্কিন সাঁজোয়া বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখতে সেই পরিখায় তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার খবর।

সরকারি বক্তব্য হলো, এই এজেন্ট দুজন বার্লিনে যুদ্ধের খবরাখবর পাঠাচ্ছিলো। মার্কিনিদের যেটুকু তথ্য দেয়া হয়েছিল তা ছিল বেসামরিক স্থাপনা বিশেষত বিদেশী দূতাবাসের অবস্থান সংক্রান্ত।

কেননা, কোনো পক্ষই চাইছিল না বলকান যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটুক। সেনার বেলগ্রেডের চীনা দূতাবাসে 'ভুলক্রমে' ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল মার্কিন বিমান। বিএনডির দাবি, কোনো তথ্যই এই দুই কর্মী সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রকে জানাননি। বরং বিএনডির সদর দপ্তরে পর্যাপ্ত যাচাই-বাছাইয়ের পর তা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে জানানো হয়েছে। কিন্তু পর্দার অন্তরালে এ ধরনের তথ্য আদান-প্রদান আসলে ইরাকে নিয়োজিত মার্কিন সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হচ্ছিল। অন্যদিকে তথ্য দেয়ার বিনিময়ে জার্মান সরকারকে জানানো হয়েছিল মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যুদ্ধ শুরুর আগে ৫ ফেব্রুয়ারি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল জাতিসংঘে ইরাকের জীবাণু অস্ত্র সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন, তার ভিত্তি ছিল জার্মানদের যোগানো গোয়েন্দা তথ্য। আসলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্রের কড়া সমালোচনা করে একঘরে হয়ে পড়া জার্মান সরকার এরূপ 'আদান-প্রদানের' মাধ্যমে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল।

তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ায় মার্কিন সরকার মোটেই বিচলিত নয়। কিন্তু বেকায়দায় পড়েছে এসপিডি। যুদ্ধের বিরোধিতা করে যে শান্তিবাদী ইমেজ শ্রোয়েডার তৈরি করেছিলেন, তাও মলিন হয়ে পড়ার আশঙ্কা মাথাচাড়া দিয়েছে। বিশেষত, সে সময় শ্রোয়েডারের মধ্য-বাম মোর্চার অন্যতম শরিক পরিবেশবাদী গ্রিন পার্টি ঘটনা তদন্তে বিশেষভাবে আগ্রহী। বিশ্লেষকদের ধারণা, যুদ্ধের বিরোধিতা করে ভোটের রাজনীতিতে জয়ী হতে চেয়েছিলেন শ্রোয়েডার। এখন যে সংসদীয় তদন্ত কমিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখবে তাতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। বিশেষত তদন্ত শুধু বাগদাদে নিযুক্ত দুই জার্মান গোয়েন্দার ক্রিয়াকলাপে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বুশ প্রশাসনের 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে'র অন্য দিকগুলোতে শ্রোয়েডার সরকার কীভাবে সহযোগিতা করেছে সে ব্যাপারেও তদন্ত হবে। বিশেষত, সন্ত্রাসী সন্দেহে আটকদের তৃতীয় কোনো দেশে নিয়ে আটকে রাখার কিংবা নির্যাতনের যে নীতি সিআইএ মেনে চলছে, তাতে পূর্ববর্তী জার্মান সরকারের যোগসূত্র কতটুকু সেটাও দেখা হবে। এছাড়া জার্মান গোয়েন্দাদের অন্য দেশের হয়ে 'সন্ত্রাসী'দের জিজ্ঞাসাবাদে অংশ নেয়াটাও তদন্ত হবে। সব মিলিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনে শ্রোয়েডার কীভাবে মার্কিন সরকারের দোসর হলো, সেটাও বের হয়ে আসবে।

এ মুহূর্তে একটা বিষয় পরিষ্কার, সেটা হলো শ্রোয়েডার গাছেরও খেয়েছেন, তলারও কুড়িয়েছেন। বিশ্ববাসীর সঙ্গে যা প্রতারণার শামিল।

সাবধান জেনারেল!

জামান আরশাদ

পবিত্র ইদুল আজহার একদিন পরের ঘটনা। পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন বাজুর গ্রামে দাওয়াত খেতে আসার কথা ছিল আল কায়েদার সেকেন্ড ইন কমান্ড ডা. আইমান আল জাওয়াহিরির। ওই গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ি। থাকেন স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও শ্বশুরকুলের লোকজন। কিন্তু জাওয়াহিরির সেখানে যাওয়া হয় না। যুক্তরাষ্ট্র তাকে খুঁজছে।

তারপরও তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন। বাজুরা গ্রামে ঈদের একদিন পরে ১৩ জানুয়ারি বিশ্বস্ত কয়েক জন অনুরাগীকে নিয়ে তার যাওয়ার কথা ছিল এবং খবরটি পৌঁছে গিয়েছিল সিআইএ-র কাছে। তারপর চুপচাপ খুবই গোপনে সিআইএ বোমা বর্ষন করলো ওই গ্রামে নির্দিষ্ট টার্গেটে। বোমা বর্ষন করলো কিন্তু পাকিস্তানের অনুমতি না নিয়ে। তার মানে দাঁড়ালো মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা অপর একটি দেশে বোমা বর্ষন করলো, স্বাধীন সার্বভৌম দেশটির অনুমতি না নিয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের মিত্র হলেও পাকিস্তান এ বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। তারা বলে, পাকিস্তান তার নিজস্ব উপায়ে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে। এতে অন্য কোনো দেশের সহযোগিতা দরকার নেই। সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানের এই কঠোর ভাষার বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব পায়।

পাকিস্তানের ক্ষেপে যাওয়ার একাধিক কারণ আছে। ইসলামাবাদ বারবার বলে আসছিল, লাদেন ও জাওয়াহিরি পাকিস্তানে নেই। তারা আছে আফগানিস্তানে। আর আফগানিস্তানের তরফে বলা হয়েছিল, শীর্ষ আল কায়েদা নেতারা তাদের ভূখন্ডে নেই। থাকলে আছে পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকাগুলোতে। এ নিয়ে দু দেশের মধ্যে একটা চাপান উতোর চলতে থাকে। পাকিস্তানে বোমা হামলার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এটা প্রমাণ করতে চাইলো, লাদেন-জাওয়াহিরি সেখানেই আছে। অর্থাৎ সিআইএ যখন খবর পাবে, ওখানে লাদেন আছে, ওখানে জাওয়াহিরি আছে, তখনই হামলা চালাবে। এটা ভেবে পাকিস্তান উদ্বিগ্ন।

দ্বিতীয়ত মার্কিন ওই বোমা হামলায় জাওয়াহিরির টিকিটাও ছেঁড়েনি। আসলে তিনি ওইদিন শ্বশুরবাড়ি যাননি। এ ঘটনায় বেশ কিছু নিরপরাধ গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় সে দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। খবর রটে, বিমান হামলার ব্যাপারে পাকিস্তানের গোয়েন্দারা যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা করেছে। এমনিতে জঙ্গি ইসু নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ ব্যাপক সমালোচনার মুখে।

পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে শেষ পর্যন্ত মোশাররফও মার্কিন বিরোধী অবস্থান নেন। তার কিছু করার ছিল না। তিনি যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বক্তব্য না দিতেন, তাহলে পুরো পাকিস্তান অচল হয়ে পড়তো। তার পরামর্শে কড়া বক্তব্য রাখেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজ। সরাসরি তিনি বলেন, 'এ ধরনের আর কোনো হামলার ঘটনা পাকিস্তান বরদাস্ত করবে না। আমাদের দেশে যা ঘটলো সে রকম আর কোনো পদক্ষেপ আমরা মেনে নেব না। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের গুরুত্ব রয়েছে, তা ধীরে ধীরে বাড়ছে। কিন্তু তাই বলে এ ধরনের হামলা মেনে নেওয়া যায় না।'

যুক্তরাষ্ট্রের কথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন দানের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফের প্রতি দেশটির জনগণের এতদিন যে ক্ষোভ ছিল, এ হামলার ঘটনায় তা রীতিমত গণবিক্ষোভে পরিণত হয়। দেশব্যাপী ফুঁসে ওঠা ইসলামী দলগুলোর পাশে এসে দাড়ায় ক্ষমতাসীন দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ-কিউ। ওই হামলায় নিরীহ পাকিস্তানি জনগণ মারা যাওয়ায় দলটি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানায়। ইসলামী দলগুলো মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ আরো জোরদার করার অঙ্গীকার করে। যদিও হামলার ঘটনায় নিরীহ জনগণের মৃত্যু হলেও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো দুঃখ প্রকাশ করা হয়নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সামনের দিনগুলো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জন্য খুবই খারাপ যাবে। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়বেন। মার্কিন ইশারায় জঙ্গি দমন করতে গিয়ে তিনি হারিয়েছেন জনসমর্থন। এখন মার্কিনিরাও প্রায় বেঁকে বসেছে। আসলে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে এমন একজন শাসক চায়, যে সারাক্ষণ ফেউয়ের মত পিছনে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু মোশাররফ এতদিন সব সামলে নিয়েছিলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তিনি ধৈর্য হারিয়েছেন।

আর ধৈর্য হারালেই বিপদ। অতীতে জিয়াউল হকসহ অনেকেই এরকম ধৈর্য হারিয়েছিলেন। আর তাদের হয়েছিল করুণ পরিনতি। সাবধান জেনারেল সাহেব!